Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 45-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জীবনবোধ ও সমাজ-বাস্তবতা : 'পদ্মানদীর মাঝি'

পীরুপদ মালিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the novels of Manik Bandyopadhyay, society has been manifested on the basis of Marxist thoughts. We know that one of the criteria of the discussion of sociology in literature is reality. This reality is actually socio-reality. Manik Bandyopadhyay, a writer of the Post-Kallol era, revolted against the artificiality and mechanical attitude of the so-called gentlemen and engaged himself in such type of writing which was totally different from that of others. As a background he chose the then East Bengal, its people and environment. He has depicted the life of the common people of that area with great skill. Such a popular novel is 'Padmanadir Majhi' (1936). In this novel, the author has depicted the intimate relationship of the fishermen of the village Ketupur with the river Padma. Before the period we are talking about, the slum-life was reflected in Bengali literature, but the reality was missing. Manik Bandyopadhyay has described the slum-life with all reality. In the background of the regional novel the lifestyle, principles, habits, convention, culture, struggle and everything of the common people of the particular area have been highlighted. The author has also depicted the sensuality in the relationship of men and women with artistic reality. The struggle of the fishermen, pleasure and pain of having a son, the festival of Rathajatra, flood in the rainy season, the advent of autumn, the disaster caused by the storm, the flight of wild ducks after the winter, the festival of colour in the spring all these are pen pictures of the real life of the common people in the society. The women characters in the novel add to the perception of life and society.

Keywords: Socio-reality, Regional, Padmariver, Fishermen, Perception of life.

আমরা অ-নিরপেক্ষ এই কথাটা জোরের সঙ্গে বলার সময় এসেছে। একইসাথে মানুষের অস্তিত্বও সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। 'অস্তিত্ব' শব্দটি যদি তাৎপর্যহীন না হয় তবে সে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত হবে। মানুষ যখনই সাহিত্য আসরে পা রাখে; তখনই তার সঙ্গে একইভাবে সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে পায়ে পা মিলিয়ে আবির্ভূত হয় তার সময় ও তার সমাজ। এই সামাজিক স্তর কখনও প্রকটিত চিরন্তন; আবার কখনও অঘোষিত। কিন্তু সে আছে – সহৃদয় হৃদয় সংবাদী সামাজিক পাঠকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিসম্পাতের প্রতীক্ষায়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য মানেই বহুরৈখিক। সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিকাশের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহিত্যকে গ্রহণ করেন অন্যতম আকার রূপে– "সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধানের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রতিবেদন। দেশ-কালের বৃহৎ ফ্রেমে বাঁধা হয় উপন্যাসের ঘটনাসমূহ; নানা স্বরের দ্বন্দ্বময়তায়, নানামুখি সংঘাতে চিহ্নিত হয় ভিন্ন

সময়ের অবয়ব, অনেকটাই প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে সামাজিক বিকাশ ও বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতময় স্তরসমূহ।"[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মূলত সমাজ বিশ্লেষিত হয়েছে মার্কসীয় চিন্তাসূত্রকে ভিত্তি করে। সমাজবিজ্ঞানী সাহিত্যে দৈনন্দিনতা, সামূহিক জীবনের সাধারণ সমস্যা, সংকট, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদির চাইতে বেশি কিছু খুঁজে পান। আসলে সাহিত্যের আধারেই সুপ্তভাবে বিরাজ করে - সমাজবিকাশের মৌল প্রবণতাসমূহ। আর সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্যতম মাপকাঠি হলো বাস্তবতা (Realism)। বাস্তবতা মানে সমাজ কাঠামোর স্থূল চিত্রমাত্র নয়। বাস্তববাদিতা হলো খুঁটিনাটি বর্ণনার সত্যতার বাইরেও গড়পড়তা পরিবেশে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা। 'গড়পড়তা পরিবেশ' বলতে এঙ্গেলস বুঝিয়েছেন উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তনের যে স্তরে সাহিত্যে স্থাপিত কালখণ্ডটি রয়েছে, সেই কালখণ্ড এবং তার মধ্যেকার বহুমুখী সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহের কথা। যে দ্বন্দ্বসমূহের উৎস নিহিত আছে আর্থিক কাঠামোর, উৎপাদন সম্পর্কের ভেতরকার দ্বান্দ্বিকতায়। কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত কথাসাহিত্যের বাস্তবতার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কোন পরিস্থিতিতে প্রকৃত ও সম্ভাব্য শক্তিসমূহ যেভাবে কাজ করছে, তাকে বিষয়গত ভাবে যদি প্রকাশ করেন, তাহলে সেখানেই লেখক এক অর্থে পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। তবে তিনি শিক্ষিত পরিমণ্ডলের ভদ্রজীবনের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও ভদ্রজীবনের ভণ্ডামিকে আজীবন বরদাস্ত করতে পারেন নি; সবহারাদের সঙ্গী হতে চেয়েছেন – হয়েছেনও। উপন্যাসের আলোচনায় এই সমাজ বাস্তবতা বিস্তারিত প্রকাশ পাবে।

উত্তর-কল্লোল যুগের একজন বিস্ময় সৃষ্টিকারী কথাসাহিত্যিক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ – ১৯৫৬)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলে সম্বোধন করেছেন। আসলে এই প্রতিভার মধ্যেই নিহিত ছিল কল্লোলের সমস্ত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। মানিকের যৌবনের অসীম কল্পনার সাথে মিলিত হয়েছিল শিল্পীর সংহতি বোধ। তাই তিনি অনাবিষ্কৃত পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকীর্ণতাকে অগ্রাহ্য করেই অনাবিল পদচারণার বলিষ্ঠ চিহ্ন রাখলেন তাঁর রচনায়। সমকালীন সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য দেউলিয়া রূপটিকে সযত্নে তুলে ধরলেন তিনি। যুক্তিবাদী মন, বস্তুনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য নিয়ে সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন তিনি। বিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস রচনায় যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রচনায় ব্রতী হলেন। তিনি জানিয়েছেন, ভদ্র জীবনকে ভালোবাসেন, ভদ্র জন-ই তার আপনজন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সমস্তই যেন তাঁর অথচ তাদের জীবনের যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হীনতা তাঁকে ভীষণভাবে প্রতিবাদী করে তোলে। এই প্রতিবাদী ভাবনা থেকেই তিনি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবশ্য জন্ম-পঞ্জিকায় তার নাম ছিল অধরচন্দ্র। গল্প রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-জীবন শুরু করলেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উপন্যাস রচনায়। সাহিত্যের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের পরিবেশ। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রকে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এইরকমই একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)। শ্রেণিবিচারের দিক থেকে বিচার করলে সাধারণভাবে একে আঞ্চলিক উপন্যাস আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-সংস্কৃতি সেই অঞ্চলের মানুষের সংগ্রাম তুলে ধরা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাতে নগরজীবনের থেকে গ্রামজীবনেরই প্রাধান্য বেশি করে লক্ষিত হয়। আলোচ্য 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও আমরা কেতুপুর নামে এক গ্রামের উল্লেখ পাই যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের গতিবিধি এগিয়েছে। কেতুপুর ছাড়াও আরও অনেক গ্রামের নাম এসেছে, সেই গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের জেলেমাঝিদের জীবনযাত্রা, বসবাস, সংস্কার, সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ সাতটি পরিচ্ছেদ ধরে ঔপন্যাসিক এই কেতুপুর ও তার সংলগ্ন

গ্রামজীবন এবং সেই অঞ্চলের জেলেমাঝিদের জীবনের ছবি তাঁর কলমের রঙিন কালিতে অঙ্কন করেছেন। আমরা উপন্যাসের গভীরে গিয়ে সেই সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব যে গ্রামজীবনের ছবি ও জেলেজীবনের সংগ্রামকে তা কতটা পরিস্ফুট করেছে।

জেলেপাড়ার অধিকাংশ পুরুষ মাছ ধরার জন্য বাড়ির বাইরে থাকে রাত্রিবেলা। তাদের ঘরে থাকে বউ, ছেলে-মেয়েরা। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কুবের রাত্রিবেলা ইলিশের মরশুমে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার বাড়িতে স্ত্রী মালা, ছেলেমেয়ে গোপী-লখা-চণ্ডী আর পিসি। কুবেরের স্ত্রী মালা নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করে। সারারাত জেগে পদ্মায় মাছ ধরার পর অসুস্থ শরীর নিয়ে কুবের যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তাকে শুনতে হল তার প্রতিবেশী নকুল দাসের গা জ্বালানো কথা। নকুল কুবেরকে বলে আমাদের পাঁচি গিয়েছিল দেখে এসে বলল কুবেরের ঘরে রাজপুত্তুর এসেছে। এরপরই শয়তানের হাসি হেসে পরিহাস করে বলে- "তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে তো থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।"[২] জেলেপাড়ার এই গরিব মানুষেরা হাসি ঠাট্টা তামাশার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। কিন্তু এই হাসি ঠাট্টা তামাশা কখনও কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কুবের রাত্রিবেলা বাড়িতে থাকে না বলে তার সন্তান রাজপুত্রের মতো হবে না এ বিষয়ে মালাকে সন্দেহের দোলায় দুলিয়েছে প্রথম নকুল দাস, আর কুবেরের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে।

মানব-জীবন ও মানব-প্রকৃতির গোপন রহস্যের আবিষ্কার এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে তিনি যে সত্যের নগ্ন মূর্তি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অভিনব। মানব-মানবীর লজ্জার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তাদের মনের জৈবিক বাসনা-কামনার অনাবৃত প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাস্তবসুলভ শিল্প-ভাবনার পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আজহার ইসলাম এর কথা- "'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তরঙ্গ-সঙ্কুল জীবনের ধারায় কুবের মাঝি, হোসেন মিঞা প্রমুখ চরিত্রের স্ফুরণ এবং সংঘাত-সংকুল ধীবর পল্লীর বর্ণনা বিশেষভাবে বাস্তবসমৃদ্ধ হয়েছে।"[৩]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেই তাঁর উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে। যে সকল ব্রাত্যজীবন ও জীবনধারণ তাঁকে প্রত্যাশিত লোকের অভিমুখী করেছিলো, তার সূত্রপাত এখান থেকেই। নির্বিত্ত শোষিত মানুষ প্রায় পশুজীবন যাপন করেছে, তাদের জীবনচর্যা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এখান থেকেই। খেয়ালী পদ্মা, উদাসী পদ্মা, দুঃখ-সুখে নিরপেক্ষ পদ্মা এদের জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছে আবার কখনও আনন্দও দিয়েছে। কেতুপুর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সোনাখালি গ্রামে জমিদারদের বাড়িতে রথের উৎসব হয়। এই কেতুপুর থেকে জেলেপাড়ার বাসিন্দারা নৌকায় করে, অন্যান্য জায়গা থেকে বহু মানুষ পায়ে হেঁটে, সুলপী থেকে নৌকায় করে অনেক মানুষ এই মেলায় আসে। মেলায় প্রথম ও শেষ দিন প্রচণ্ড ভিড় হয়। মাঝের দিনগুলি একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কাপড়ের দোকান, মনোহারির দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান তো বসে - আর একদিকে গোরু ছাগল বিক্রি হয়, কাঁঠাল-আনারসের দোকান বসে। মেয়েরা শখ করে শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি পরে। ছেলেদের কোমরে নতুন ঘুনসি বেঁধে দেয়। কেউ কেউ বউদের জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা, খাবার ও সংসারের জন্য দরকারি জিনিস কিনে নিয়ে বাড়ি যায়। কুবের, গণেশ, সিধু, হোসেন মিয়া, ধনঞ্জয় - এরা সবাই মেলায় গিয়েছিল। সিধু মেলা থেকে এক পয়সা খরচ না করে তিনটি দাগ ধরা প্রকাণ্ড ফজলি আম, একটা তুলতুলে পাকা আস্ত খাজা কাঁঠাল, সের তিনেক একসঙ্গে চাল-ডাল-খুদ আর খাসির একটা মাথা নিয়ে এসেছিল। এভাবেই তারা নিজেদের দেখতে অভ্যাস করেছিল এবং এর মধ্যেই তাঁরা জীবনের রসদ খুঁজে নেয়।

'পদ্মানদীর মাঝি'-র যে গ্রামজীবন সেই গ্রামজীবনের চরিত্রগুলি সুখ-দুঃখে পাশাপাশি থাকলেও কেউ কাউকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না কারণ তারা আর্থিক দিক থেকে অতটা উন্নত নয়। একমাত্র হোসেন মিয়া ও অনন্ত তালুকদার ছাড়া কেউ বড়লোক নয়। এই দুজনের মধ্যে আবার একমাত্র হোসেন মিয়াই সকলকে সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। একদিন কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়াও কুবেরের ভাঙা ঘরে এসে উঠলো। হোসেন

মিয়াকে কুবের তার ভাঙা ঘরে বসতে দেয়। চাটাইয়ের ওপর বসে হোসেন গোপিকে আদর করে ডেকে বলে- "পিয়াস জানায় বিবিজান, পানি দিবা না? গোপি ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটা গোপি করিয়া লইল শুদ্ধ।"[৪] অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করলেও এমনকি হোসেন মিয়া হিন্দুদের সাহায্য করলেও মানুষের মন থেকে সংস্কার চলে যায় নি। তবে গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম যতোই পৃথক হোক তাদের দিনযাপনে কোন পার্থক্য নেই 'সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে- দারিদ্র্য'। এই দারিদ্র্যের অধর্মেই ঘুমন্ত অতিথি হোসেন মিয়ার ব্যাগ থেকে কুবের যৎসামান্য খুচরো পয়সা চুরি করে। আর মেয়ে গোপি সেই চুরি দেখে ফেললে, সহজাত নীতিবোধে তার মনে হয় একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল। এইসব ঘটনা সমাজ-বাস্তবতার পটভূমিকে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রয়োজনেই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

মাছধরার সংগ্রাম, পুত্রলাভের আনন্দবেদনা, রথের উৎসব, বর্ষার বন্যা, শরতের আগমন, আশ্বিনের ঝড়ের বিপর্যয়, শীতের পর বুনো হাঁসের ঝাঁকবেঁধে উড়ে যাওয়া, বসন্তে দোল-উৎসব - সময় প্রবাহে এই উপন্যাসে যেন এসে যায় সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন- "'পদ্মানদীর মাঝি' তে - বংশপরম্পরাগত শাখা-প্রশাখাবিস্তারী সচেতন শৈথিল্যময় কাহিনীর মন্থরতা নেই। কেতুগ্রামের মালিন্যময় দরিদ্র জীবনের বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন লেখক, আবার অনন্তপ্রবাহিনী পদ্মার স্রোত দিয়ে সেই মালিন্য, সেই বাস্তবতাকেই যেন তিনি ঈষৎ পরিমাণে মুছে দিয়ে যান।"[৫] উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যখন কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয় তার সঙ্গে টিপি টিপি বৃষ্টি, বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকে জেলেপাড়ার অর্ধেক ঘরের চাল ভেঙে পড়লো, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলে পদ্মা আছড়ে পড়লো কেতুপুরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও নারীরা হাহাকার করে রাত কাটালো, ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ গুমরে গুমরে কাঁদতে শুরু করলো তখন মেয়েরা ঝড়ের দেবতাকে উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসার জন্য আহ্বান করেছে অর্থাৎ শান্ত করতে চাইছে। এর মধ্যে গ্রাম্য মেয়েদের সংস্কার খুঁজে পাওয়া যায়।

পদ্মানদীকে পটভূমি করে ঔপন্যাসিক একটি পরিচ্ছন্ন স্থানিকতা দিয়েছেন। পদ্মার তীরে কেতুপুর অর্থাৎ যেখানে কুবের, গণেশ, নকুল, হীরু, আমিনুদ্দি, রাসু, সিধু, মুরারি, অনুকূল, যুগল, প্রীতম আরও অনেকে বাস করে। তবে কেতুপুরের পুরোটা জুড়ে এদের বাস নয়, তার জেলেপাড়ায়, লেখকের বর্ণনায়- "পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই।"[৬] এভাবেই এরা ঘেঁষাঘেঁষি করে জীবন অতিবাহিত করে। তাই জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর কান্না কোনদিন বন্ধ হয় না। বেঁচে থাকা নয়, টিকে থাকাটাই এখানে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের স্বাদ এখানে ক্ষুধা-পিপাসায়, কাম-মমতায়, স্বার্থ-সংকীর্ণতায় আর দেশি মদে। পদ্মা আর পদ্মার খালে এরা মাছ ধরে, সেই মাছ ঝাঁকায় করে মেয়েরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করে। দারিদ্র্য এদের প্রধান সমস্যা। সকলের কাছেই এরা শোষণের ও প্রতারণার পাত্র। জেলেপাড়ার এই চরিত্রগুলির মধ্যে কুবেরকে প্রতিনিধি শ্রেণির চরিত্র করা হয়েছে এখানে। তার দৃষ্টিতেই কাহিনি দেখেছেন লেখক। লেখকের বর্ণনায় জেলে-মাঝিদের নিয়ে কেতুপুর গ্রামটির জেলেপাড়া জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পদ্মা-নির্ভর জেলেমাঝিদের জীবনযাত্রা জীবনধারণ সমাজ-বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এবার এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মাধ্যমে পরিস্ফুট জীবনবোধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে। জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র কুবের। তার স্ত্রী মালা আজন্ম পঙ্গু। কুবেরের শ্যালিকা কপিলা এই উপন্যাসের আনেকটা অংশ জুড়ে আছে। কুবেরের নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনে প্রথম ঢেউ তোলে কপিলা। কুবের-কপিলার প্রেম উপন্যসের একটা মুখ্য দিক। পদ্মার নায়ের মতোই কপিলা ভেসে এসেছিল কুবেরের সংসারে। স্বামীর প্রতি বিরূপতা থেকে, স্বামীর

প্রেম না পাওয়ার জন্য সে কুবেরের দিকে আকৃষ্ট হয় নি; তবুও সে আকর্ষণের জাল বিস্তার করেছে- "আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে জেলেপাড়ার ভীষণ ক্ষতি হয়। কুবেরেরও ঘর ভেঙে যায়। এই ঘর ভেঙে যাওয়া যেন অনেকটা গৃহদাহের মহিমের ঘর পুড়ে যাবার মতোই ইঙ্গিতবহ। দূরে মালার দাম্পত্যপ্রেমের সে ঘর ঝড় ভেঙে দেয়। নতুন করে সে ঘর তৈরি হয়। কিন্তু সেই নতুন ঘরে তাদের দাম্পত্য প্রেমের সেই আলো আর প্রবেশ করে নি।"[৭] এরপরেই দেখা যায় কপিলা নানা ছলাকলায় সেবায় যত্নে কুবেরকে অবিরাম আকর্ষণ করে চলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গোপির পা ভাঙার কথা। এইসময় কপিলা প্রাণ দিয়ে সবার সেবা যত্ন করে। গোপিকে নিয়ে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যায়। সবাই চলে এলেও কপিলা কিছুতেই আসে না। বিকেলে কোন নৌকা না পাওয়ায় কুবের-কপিলা একত্রে রাত্রি যাপন করে। কুবেরের কথামতো কপিলা মিথ্যা বলতে অস্বীকৃত হলে কুবের ভেবেছে- "বলুক! পুরুষ মানুষ কুবের, কী ভয় তার? কপিলার সত্যবাদিতার ফল যদি কেহ ভোগে ভুগিবে কপিলাই!"[৮]

'পদ্মানদীর মাঝি' তে কপিলার শরীর হেলিয়ে দুই-চারটি তীক্ষ্ণ বাক্য বাণ ছোড়া, রহস্যায়িত শব্দব্যয়, মালার পঙ্গুতা, প্রেমের চলচ্ছক্তিবিহীনতাকে দূরে সরিয়ে কুবেরকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ- "তামুক ফেইলা আইছ মাঝি। কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে। বলে, খাটাসের মতো হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই? কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ! তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে?"[৯] গোপি ভালো হয়ে উঠলে মালার মনে আশার আলো উঁকি দেয়। পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সেও আপ্রাণ চেষ্টা করে। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মেজবাবুর নৌকায় করে আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিজের পা টা দেখিয়ে আসে। আর এই সংবাদ কুবেরের জীবনটাকে বিস্বাদ করে দেয়। মালা বাড়িতে ফিরে এলে উভয়ের মধ্যে তীব্র কলহ হয়। কুবের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে জলন্ত কলকে মালার গায়ে ছুঁড়ে মারে। কোলের শিশু সহ মালার শরীরের জায়গায় জায়গায় পুড়ে যায়। পাড়ার লোকে তামাশা দেখতে যখন উঠোনে ভিড় করে তখন কুবের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তার নিজের কাপড় এনে দেয় এবং উঠোনের লোকজনদের তাড়িয়ে দেয়। কুবেরের দাম্পত্য-জীবনের যে ছবি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন, সমাজ-বাস্তবতায় তা যেমন অকৃত্রিম তেমনই লোকায়ত নারী-জীবনের পরিচায়কও বটে।

লোকায়ত জীবনের যে সমস্ত চেনা মানুষের কাহিনি রচনার প্রেরণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন, তাদের প্রথম পরিপূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন 'পদ্মানদীর মাঝি' তে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন- "পূর্ববঙ্গের 'নিম্নশ্রেণি-অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবন' - নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ও পুর্ববঙ্গবাসীর অকৃত্রিম স্বাভাবিক কথ্যভাষার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠল সাহিত্যের পৃষ্ঠায়।"[১০] হয়তো মানিক বান্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন লোকায়ত মানুষের জীবন-সংগ্রামের কাহিনি রচনা করতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়া ও তাঁর ময়নাদ্বীপ উপন্যাসটিকে নতুন মাত্রা এনে দেয়। সুমিতা চক্রবর্তীর কথায়- "... 'ময়নাদ্বীপ' প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতীক-সত্যি সত্যিই বাস্তবের কোনো নির্জন দ্বীপ নয়। ধনতন্ত্রবাদীর পুঁজির লগ্নি, উৎপাদনের বৃদ্ধি ও লভ্যাংশের অধিকার নানা মাধ্যম ব্যবহার করে ঘটতে পারে। কোথাও কলকারখানা, কোথাও কৃষি-পণ্য, কোথাও জনরঞ্জকপণ্য - পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে একই, কিন্তু উৎপাদন আলাদা আলাদা।"[১১] উপন্যাসে আমরা দেখেছি একইরকমভাবে লোভ দেখিয়ে, বিপদে ফেলে নর-নারী সংগ্রহ করে ময়নাদ্বীপে নিয়ে আসে আর তারাও বাধ্য হয়। কুবের যখন নিরুপায় হয়ে হোসেনের কাছে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করে সে চুরি করে নি তখন কিছুক্ষণ চুপ করে হোসেন বলে - "ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।"[১২] তখন আর কিছুই করার থাকে না কুবেরের। কপিলা চুপিচুপি কুবেরকে জেল খাটার কথা বলে, তখন কুবের বলে- "হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।"[১৩] অবশেষে কুবেরের সঙ্গ দেয় কপিলা। কুবের জানে দুদিন পরেই তাঁরও মেয়ে-জামাই এসে উঠবে এই ময়নাদ্বীপে। সেখানে নতুন সন্তানদের জন্ম হবে আর তারাই ময়নাদ্বীপের নতুন বাসিন্দা হয়ে উঠবে। ময়নাদ্বীপ এর স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে আর এক জীবনবোধ ও সমাজ-বাস্তবতার পরিচয় দিয়ে যান লেখক যা সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের দিকে পৃথিবীর যাত্রাকে ইঙ্গিত করে।

সূত্র নির্দেশ :

১. 'কথাসাহিত্যের নানা পাঠ', প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহালয়া ২০১১, পৃঃ ৮০
২. 'পদ্মানদীর মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশত্তম সংশোধিত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১২, পৃঃ ১৪
৩. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' আধুনিক যুগ, আজহার ইসলাম, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৫৩৪
৪. 'পদ্মানদীর মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশত্তম সংশোধিত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১২, পৃঃ ৩২
৫. 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অশ্রুকুমার শিকদার, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫, পৃঃ ২০৮
৬. 'পদ্মানদীর মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশত্তম সংশোধিত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১২, পৃঃ ১২ - ১৩
৭. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুনঃপাঠ', সম্পাদনা তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০১১, পৃঃ ২০১
৮. 'পদ্মানদীর মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশত্তম সংশোধিত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১২, পৃঃ ৬১
৯. ঐ, পৃঃ ৪৪
১০. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১০, পৃঃ ২৬৩
১১. 'উপন্যাসের বর্ণমালা', সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০৩, পৃঃ ১৭৫
১২. 'পদ্মানদীর মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চত্রিংশত্তম সংশোধিত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১২, পৃঃ ১০৭
১৩. ঐ, পৃঃ ১০৮